এপ্রিল ২০১৯
৮ম পর্ব । ২য় সংখ্যা

ইনফো মেডিকাস

স্বাস্থ্য সাময়িকী

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

সূচী

রোগের ইতিকথা	২
মানবদেহ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৫
বিশেষ প্রবন্ধ	৬
জীবাণু পরিচিতি	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
চিকিৎসা পদ্ধতি	১২
স্বাস্থ্যকথা	১৪
ইনফো কুইজ	১৫

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান

ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান

ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন

ডাঃ আদনান রহমান

ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী

ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক

ডাঃ ফাহিমা জাহান ইশানা

ডাঃ সাইকা বুশরা

ডাঃ মোহাম্মদ সাফী হাসান

ডাঃ ইব্রাহীম কবির

ডাঃ মোঃ শোয়েব আখতার

কলেরা

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সালে এথেন্সের চিকিৎসাবিদ হিপোক্রেটিস প্রথম কলেরা রোগটি সনাক্ত করেন। এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহ জনিত সংক্রামক রোগ যা *Vibrio cholerae* নামক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞানী রবার্ট কচ *Vibrio cholerae* জীবাণুটি আবিষ্কার করেন। এটি একটি 'কমা' আকৃতির ব্যাকটেরিয়া যা কলেরা আক্রান্ত রোগীর মল দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে ছড়ায়। শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর এ জীবাণু ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে লেগে যায় এবং সেখানে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ১৮০০ শতকে প্রথম মাংসপেশিতে প্রয়োগযোগ্য কলেরার টিকা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেটি তেমন কোন কার্যকরি পরিবর্তন আনতে পারেনি। পরবর্তিতে ১৯৮০ সালে সুইডেনের বিজ্ঞানী ড. জ্যান হমগ্রেন কলেরার রোগের মুখে খাওয়ার একটি টিকা আবিষ্কার করেন। কলেরা রোগ সংক্রমণের শুরুতে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে তা শনাক্ত করার জন্য কলকিট নামের একটি ডিপস্টিক তৈরী করেছেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) গবেষকেরা। যার মাধ্যমে ১৫ মিনিটের মধ্যেই কলেরা শনাক্ত করা যাবে।

রবার্ট কচ
(১৮৪৩ - ১৯১০)

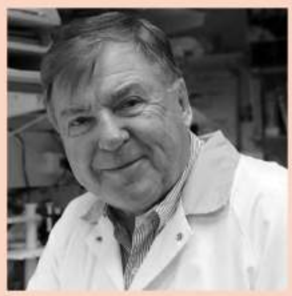

ড. জ্যান হমগ্রেন
(১৯৩৯ - ১৯৯৩)

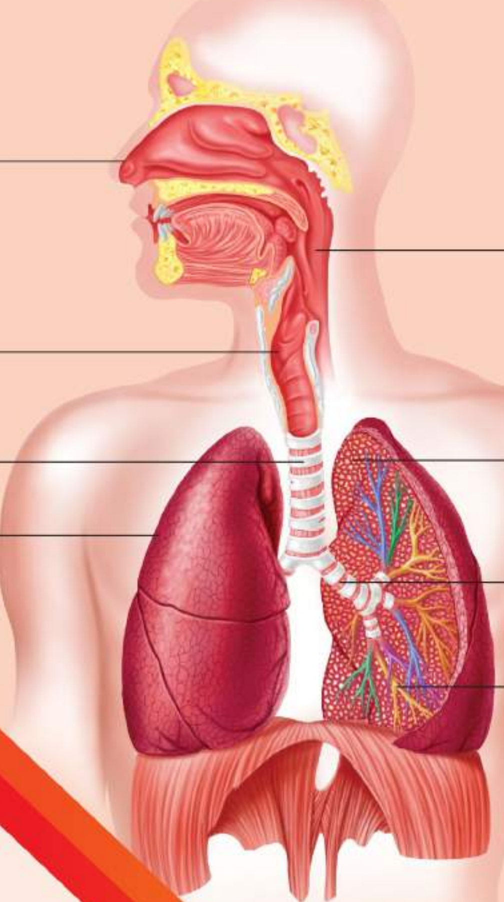

শ্বসনতন্ত্র

যে সমস্ত অঙ্গের মাধ্যমে আমরা বায়ু হতে আমাদের শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং শরীর হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি, তাদের একত্রে শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System) বলে ।

শ্বসনতন্ত্রের অংশসমূহ

শ্বসনতন্ত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই দুই ভাগের মাধ্যমে আমরা বায়ু হতে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং শরীর হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে ত্যাগ করি।

শ্বসনতন্ত্রের উপরি ভাগ (Upper Respiratory Tract)

- নাক (Nose)
- ফ্যারিংস (Pharynx)
- ল্যারিংস (Larynx)

শ্বসনতন্ত্রের নিম্ন ভাগ (Lower Respiratory Tract)

- ট্রাকিয়া (Trachea)
- ব্রংকাস (Bronchus)
- ব্রংকিওল (Bronchiol)
- অ্যালভিওলাই (Alveoli)
- ফুসফুস (Lung)

শ্বসনতন্ত্রের অংশসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-

নাক- শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অংশ হলো নাক। নাকের পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে নাসারন্ধ্র বলে। ন্যাসাল সেপ্টামের মাধ্যমে নাসারন্ধ্রকে দুই ভাগে আলাদা করা হয়েছে। নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভেতরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল যার প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। লোমগুলো ছাঁকনির মত বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে।

ফ্যারিংস- শ্বসনতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটি হলো ফ্যারিংস। এটি নাক ও ল্যারিংস এর মাঝে অবস্থিত। ফ্যারিংসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়- ন্যাসো ফ্যারিংস, ওরো ফ্যারিংস ও ল্যারিংগো ফ্যারিংস।

ল্যারিংস- এটি ফ্যারিংস ও ট্রাকিয়া এর মধ্যে অবস্থিত।

ট্রাকিয়া- এটি ল্যারিংস ও ব্রংকাস এর মধ্যে অবস্থিত। ট্রাকিয়াতে ১৬ থেকে ২০ টি 'C' আকৃতির কার্টিলেজ থাকে।

ব্রংকাস- বক্ষ গহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষপ্রান্ত ডানে ও বামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়, এদের নাম ব্রংকাস। ডান ব্রংকাসটি প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত ছোট এবং তিন ভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খন্ডে প্রবেশ করে। অন্যদিকে বাম ব্রংকাসটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং দুই ভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে।

ব্রংকিওল- ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্রংকাস আরও বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার শাখা গঠন করে। এদেরকে ব্রংকিওল বলা হয়।

অ্যালভিওলাই- ফুসফুসের অভ্যন্তরে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দিয়ে গঠিত অংশকে অ্যালভিওলাই বলা হয়। ব্রংকিওলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তগুলোকে অ্যালভিওলার নালি বলে যা অ্যালভিওলার থলিতে উন্মুক্ত হয়। প্রতিটি অ্যালভিওলার থলি কতকগুলো অ্যালভিওলাই নিয়ে গঠিত। এখানে অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড এর বিনিময় হয়।

ফুসফুস- বক্ষ গহ্বরের দুপাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। ডান দিকের ফুসফুস তিনটি খন্ডে বিভক্ত এবং বাম দিকের ফুসফুস দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খন্ড আবার লোবিউল নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০ টি এবং বাম ফুসফুসে ৮ টি লোবিউল থাকে । ফুসফুস দুটি প্লুরা (Pluera) নামক একটি পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এই প্লুরার দুটি স্তর রয়েছে। বাইরের স্তরটিকে প্যারাইটাল এবং ভেতরের স্তরটিকে ভিসেরাল স্তর বলা হয়। স্তর দুটির মাঝে অবস্থিত সেরাস ফ্লুইড নামক তরল পদার্থ ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

শ্বসন প্রক্রিয়া

সাধারণত শ্বাস নিতে (নিঃশ্বাস) আমাদের ২ সেকেন্ড এবং ছাড়তে (প্রশ্বাস) ৩ সেকেন্ড সময় লাগে। এ হিসাবে সাধারণ অবস্থায় একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৮ বার শ্বাস নেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি হলো ২০ থেকে ৩০ বার। নবজাতকের জন্মের পরে কান্নার সাথে সাথে ফুসফুস কাজ করা শুরু করে। অক্সিজেন শ্বাসের মাধ্যমে নাকের মধ্য দিয়ে প্রথমে আমাদের শরীরে ঢুকে। এরপর ল্যারিংস ও ট্রাকিয়া হয়ে তা ফুসফুসে ঢুকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের ফুসফুসে অ্যালভিওলাইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। অ্যালভিওলাইয়ের চারপাশ কৈশিক রক্তনালী (Capillaries) দ্বারা আবৃত থাকে। এখানেই নিঃশ্বাসের সময় অক্সিজেন নেয়া এবং প্রশ্বাসের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফেরত দেয়ার কাজ হয়। আমাদের শ্বাস প্রক্রিয়া কিছু মাংশপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান মাংশপেশী গুলো হলো- ডায়াফ্রাম (Diaphragm), ইন্টারকোস্টাল পেশী-সমূহ (Intercostals Muscles), স্টারনোক্লিডোমাসটয়েড (Sternocleidomastoid) এবং পেক্টরালিস মাইনর (Pectoralis Minor)।

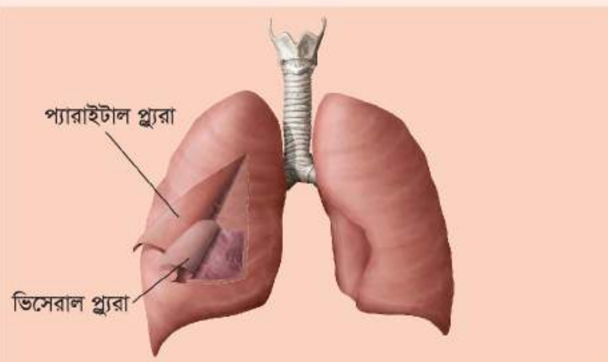

ফুসফুস

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

- শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবেশে বের করে দেয়
- শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত অক্সিজেন কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে
- শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০-৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এতে দেহের পানির সাম্যতা বজায় থাকে
- শ্বাস ছাড়ার সময় কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে
- শ্বাসক্রিয়ার সময় বায়ুর মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়, এতে দেহের পিএইচ (pH) নিয়ন্ত্রণে থাকে

শ্বসনতন্ত্রের পরিচিত রোগ

- নিউমোনিয়া (Pneumonia)
- ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenzae)
- হাঁপানি (Asthma)
- যক্ষা (Tuberculosis)
- সিওপিডি (COPD)
- ব্রংকাইটিস (Bronchitis)
- ফুসফুসে ক্যান্সার (Lung Cancer)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ছুলি

ছুলি একটি ছত্রাক জনিত ছোঁয়াচে রোগ। এই রোগে মুখে, হাতে, ঘাড়ে, পিঠে বা শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে সাদা বা বাদামি রঙের দাগ দেখা যায় যা কখনও কখনও হালকা চুলকানির মত হয় এবং শুষ্ক ও খসখসে হয়ে ঝরে পড়ে। স্যাঁতস্যাঁতে ও গরম আবহাওয়ায় ছুলির সংক্রমণ বেশী হয়। আবার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও ছুলি হতে পারে। তাই একজনের ছুলি হলে অন্যদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চোখের ছানি

মানবদেহের সকল অঙ্গের মধ্যে চোখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। চোখের ছানি হলো চোখের এমন একটি সমস্যা যেখানে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ বা ঘোলা হয়ে যায়। চোখের ছানি হলে প্রথমে যেকোনো বস্তুকে ঝাপসা দেখা যায় এবং পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি কমে আসে। এটি সাধারণত বার্ধক্যজনিত বা আঘাতজনিত কারণে হয়ে থাকে। এছাড়া ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিরও চোখে ছানি হতে পারে।

স্কার্ভি

স্কার্ভি দাঁতের মাড়ির খুব পরিচিত একটি রোগ। সাধারণত শরীরে ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এই রোগে দাঁতের মাড়ি লাল হয়ে ফুলে যায়, সামান্য আঘাতেই দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত ঝরে, দাঁতের গোড়া মাড়ি থেকে আলগা হয়ে যায় ফলে দাঁত নড়ে যায়, মাড়িতে ঘা ও পুঁজ হয় এবং চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। স্কার্ভি হলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য ও ফল খেতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

গর্ভকালীন সময় কোন মায়ের রক্তে গ্লুকোজের তারতম্য যদি প্রথম বারের মতো সনাক্ত হয় তখন তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলে। সাধারণত গর্ভফুলের (Placenta) হরমোন গুলোর তারতম্য এর জন্য মায়েরা গর্ভকালীন সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে প্রতি ১০০ জন মায়ের মধ্যে ২-৮ জন মা গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে ৮৭.৫% নারী গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং ১২.৫% নারী গর্ভধারণের আগে থেকেই ডায়াবেটিসে ভুগে থাকে। তাই গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য সঠিক সময়ে ডায়াবেটিস নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

ঝুঁকি

যেসব মায়েদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তারা হলো-

- গর্ভধারণের পূর্বে যদি কোন মায়ের ডায়াবেটিস থাকে
- মায়ের বয়স যদি ৩০ বছর এর বেশি হয়
- পূর্ববর্তী প্রসবকালীন জটিলতা যেমন- গর্ভপাত, সন্তান ধারণের অক্ষমতা ইত্যাদি
- পরিবারের কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে
- মা যদি শারীরিক পরিশ্রম কম করে
- মায়ের উচ্চতা অনুযায়ী যদি ওজন বেশি হয়
- পূর্বের প্রসবকালীন সময় বাচ্চার ওজন যদি ৪ কেজি এর বেশি হয়

লক্ষণ

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হলে নিচের লক্ষণসমূহ দেখা যায়-

- অতিরিক্ত দূর্বলতা অনুভূত হওয়া
- বেশি বেশি পিপাসা লাগা
- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
- বার বার প্রস্রাবের ইনফেকশন হওয়া
- চোখে ঝাপসা দেখা
- বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া
- ওজন কমে যাওয়া

পরীক্ষা

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হলে যে সকল পরীক্ষা করা হয়-

- গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ পরীক্ষা (Glucose Challenge Test)
- ওজিটিটি (OGTT)
- আরবিএস (RBS)
- এইচবিএওয়ানসি (HbA1c)
- হিমোগ্লোবিন (Hb%)
- প্রস্রাব পরীক্ষা (Urine Test)
- প্রস্রাবের কালচার (Urine Culture)

নিচে গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ পরীক্ষা ও ওজিটিটি এর বর্ণনা দেয়া হলো-

গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ পরীক্ষা (Glucose Challenge Test)

প্রথমে মাকে ৫০ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়াতে হবে এবং খাওয়ানোর ৬০ মিনিট পর রক্ত নিয়ে রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করতে হবে এবং পরীক্ষার ফলাফলে যদি রক্তের গ্লুকোজ এর পরিমাণ ৭.৮ মিলিমোল/লিটার এর বেশি হয় তখন বুঝতে হবে মা গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন।

ওজিটিটি (OGTT)

- যেসকল মায়ের গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ পরীক্ষায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৭.৮ মিলিমোল/লিটার এর বেশি আসে তখন সেই মাকে ওজিটিটি (OGTT) পরীক্ষা করতে হয়
- ওজিটিটি (OGTT) পরীক্ষা করার শুরুতে মাকে ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাইয়ে পরীক্ষাটি করতে হবে। ওজিটিটি (OGTT) পরীক্ষার ফলাফল নিচে বিশ্লেষণ করা হলোঃ
  - ওজিটিটি করার সময় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ শূন্য মিনিটে যদি ৬.১ মিলিমোল/লিটার এর বেশি আসে অথবা ১২০ মিনিটে যদি ৭.৮ মিলিমোল/লিটার এর বেশি আসে, তখন এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে যে মা গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত

রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা

চিকিৎসা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস শুধু ডায়েট এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হলে খুব ভালোভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ না হলে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। এজন্য প্রথমেই রোগীকে একটি খাদ্য তালিকা দিতে হবে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মায়েদের এমন খাবার দিতে হবে যা তাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। তবে খাবারের পুষ্টিগুণের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। মাকে নিয়ম অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে বারবার খাবার খেতে বলতে হবে।

পরামর্শ

- গর্ভবতী মাকে প্রতি ২ সপ্তাহ পর পর গর্ভকালীন সময়ের ৩০ সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে হবে এবং ৩০ সপ্তাহের পরে প্রতি সপ্তাহে মাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে যত দিন না পর্যন্ত মায়ের প্রসব না হয়
- গর্ভাবস্থায় মাকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে হবে

গর্ভাবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ, রক্তচাপ ও শারীরিক ওজনের পরিমাপ	
রক্তে গ্লুকোজের পরিমাপ	
রক্তের গ্লুকোজ	খাবারের পূর্বে < ৬.০ মিলিমোল/লিটার খাবারের পরে < ৬.০ মিলিমোল/লিটার
এইচবিএওয়ানসি (HbA1c)	< ৬.৫%
রক্তচাপের পরিমাপ	
রক্তচাপ	সিস্টোলিক রক্তচাপ ১১০-১২৯ মিলিমিটার অফ মার্কারি ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬৫-৭৯ মিলিমিটার অফ মার্কারি
শারীরিক ওজনের পরিমাপ	
সম্পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মায়ের ওজন	১০-১৫ কেজি বাড়বে

- গর্ভবতী মাকে সময়মত ইনসুলিন নিতে বলতে হবে
- নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করতে বলতে হবে
- গর্ভবস্থার শুরুতে এবং প্রতি তিন মাসে একবার এইচবিএওয়ানসি (HbA1c) পরিমাপ করতে বলতে হবে
- হালকা শারীরিক ব্যায়াম করতে বলতে হবে

খাদ্য তালিকা

- প্রথম তিন মাস দৈনিক ৩০ কিলোক্যালোরি/কেজি (kcal/ kg) খাবার খেতে বলতে হবে এবং পরবর্তীতে ৩৮ কিলো ক্যালোরি/কেজি (kcal/ kg) খাবার খেতে বলতে হবে
- প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ৫০-৬০% শর্করা, ৩০% চর্বি এবং ১০-২০% আমিষ খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে
- সময় এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন তিন বেলা খাবার গ্রহন করতে বলতে হবে
- এছাড়া প্রতিদিন তিন বেলা খাবার গ্রহনের পাশাপাশি হাল্কা নাস্তা করতে বলতে হবে

ব্যায়াম

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভাবস্থায় নিয়মিত হাল্কা হাঁটার অভ্যাস করতে হবে, তবে ভারি ব্যায়াম করা যাবে না।

ওষুধ

- গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে প্রধান ওষুধ হচ্ছে ইনসুলিন
- গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে তখনই ইনসুলিন প্রয়োজন হয় যখন-
  - সঠিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রন হয় না
  - যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ওজন না বাড়ে
  - যদি খালি পেটে প্রস্রাবে কিটোন পাওয়া যায়
- যদি কোন মহিলার ডায়াবেটিস থাকে এবং সে যদি নিয়মিত ডায়াবেটিসের ওষুধ মুখে খেয়ে থাকে তাহলে গর্ভধারণের পূর্বে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনসুলিন ব্যবহার করতে হবে

ইনসুলিন গ্রহণ

গর্ভকালীন পর্যবেক্ষণ

নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা ও ইনসুলিনের মাত্রা নির্ধারণ গর্ভকালীন ডায়াবেটিস চিকিৎসার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গর্ভবতী মায়েরা এটি চর্চা করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও একজন গর্ভকালীন ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত মহিলার গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি এবং রক্তচাপ নিয়মিত পরিমাপ করতে হবে।

প্রসব পরবর্তী চিকিৎসা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রসবের পর পরই ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এজন্য প্রসবের পরই মায়ের রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করে পরবর্তীতে ইনসুলিন দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসময় রক্তের গ্লুকোজ স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে ইনসুলিন বন্ধ করে দিতে হবে। একবার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকলে পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। সেজন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরামর্শ দিতে হবে।

জটিলতা

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের জটিলতাসমূহ-

- অ্যাবরশন বা প্রথম তিন চার মাসের মধ্যে সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে
- রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে প্রি-একলাম্পসিয়া হতে পারে
- ঘন ঘন ইনফেকশন ও ইনফেকশনের কারণে সময়ের আগেই পানি ভেঙে যেতে পারে
- প্রসব পরবর্তী ইনফেকশন হতে পারে

জটিলতা এড়াতে করণীয়

সর্বোপরি ডায়াবেটিস একটি জটিল কিন্তু নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ। যেসকল নিয়ম মেনে চললে গর্ভকালীন জটিলতাসমূহ এড়ানো সম্ভব সেগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- পরিকল্পিত গর্ভধারণ ও গর্ভধারণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে (Pre Conception Counseling)
- মাসিক বন্ধ হলে যত দ্রুত সম্ভব গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের পরীক্ষা করতে হবে
- ডায়াবেটিস ধরা পড়লে প্রয়োজনে নিয়মিত ইনসুলিন নিতে হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে হবে
- ইনসুলিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করতে হবে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস
(Neisseria meningitidis)

বৈশিষ্ট্য

- নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস এক ধরণের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া
- এর আকৃতি গোলাকার
- ইহা সাধারণত মানব কোষের মধ্যে থাকে
- ইহার পিলাই আছে, যার মাধ্যমে ইহা মানব কোষের সাথে লেগে থাকে
- এদের ক্যাপসুল থাকে
- এদের স্পোর থাকে না
- এদের ফ্লাজেলা নেই, তাই এরা চলাচল করতে পারে না
- এদের এন্ডোটক্সিন (লাইপোপলিসেকারাইড) থাকে

যে সকল রোগ করে

নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস দ্বারা মানবদেহে যে সকল রোগ সৃষ্টি করে সেগুলো হলো-

- মস্তিষ্ক- মেনিনজাইটিস
- রক্ত- সেপ্টিসেমিয়া
- নাক- নেসোফ্যারিঞ্জাইটিস
- ত্বক- ডার্মাটাইটিস
- হৃদপিন্ড- মায়োকার্ডাইটিস
- হাড় ও জোড়া- আর্থ্রাইটিস

চিকিৎসা

উল্লিখিত রোগের কারণে যে সকল এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় তা নিচে দেয়া হলো-

- সেফট্রায়াক্সন (Ceftriaxone)
- সেফোটেক্সিম (Cefotaxime)
- অ্যামপিসিলিন (Ampicillin)
- পেনিসিলিন জি (Penicillin G)
- ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)
- মেরোপেনেম (Meropenem)
- টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline)
- ভ্যানকোমাইসিন (Vancomycin)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

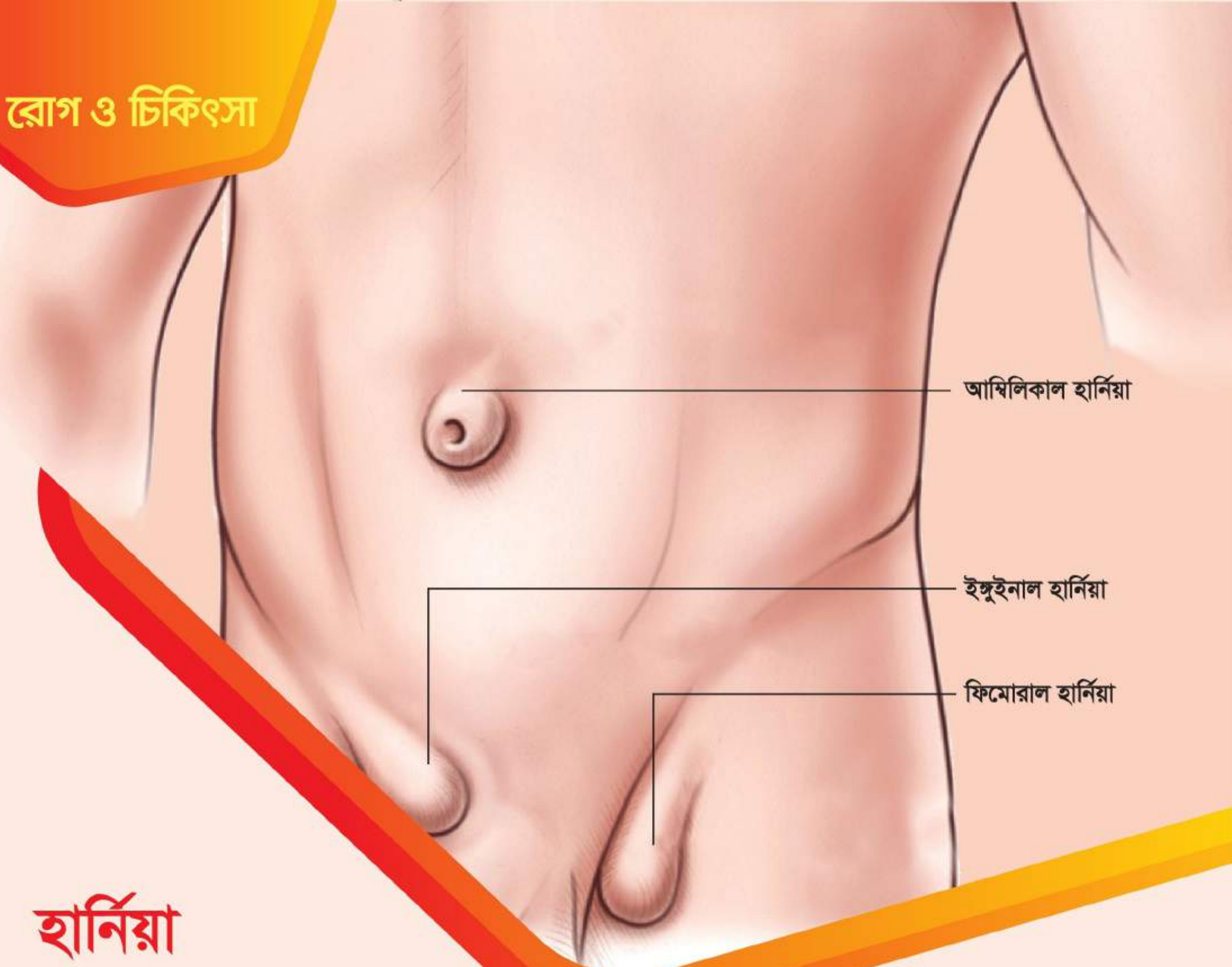

হার্নিয়া

হার্নিয়া একটি অতি পরিচিত রোগ। জন্ম থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে কারো এই রোগ হতে পারে। মাংসপেশীর দুর্বলতা ও গঠনগত ত্রুটির জন্য যখন শরীরের অভ্যন্তরের কোনো অঙ্গের অংশ যথাস্থান থেকে বের হয়ে আসে বা বের হয়ে আসার মতো অবস্থা তৈরি হয় তখন তাকে হার্নিয়া বলে। যদি কোন কারণে পেটের অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ঐ চাপে স্থানচ্যুত হয়ে পেটের দুর্বল জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে তখন নাভী, উদর ও উরুর সংযোগস্থল, পূর্বে সার্জারি হয়েছে এমন অংশে ও অন্ডকোষ ইত্যাদি এলাকা ফুলে ওঠে। পুরুষদের ক্ষেত্রে সাধারণত কুঁচকিতে (Groin) হার্নিয়া বেশি হয়ে থাকে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত উরুর উপরের অংশে হার্নিয়া হয়ে থাকে। হার্নিয়া হলে একই সঙ্গে তা দেখা এবং অনুভব করা যায়। জন্মগতভাবে প্রাপ্ত হার্নিয়া, শিশু ভূমিষ্ঠকালে উপস্থিত থাকতে পারে। তবে সাধারণত হার্নিয়ার বহিঃপ্রকাশ হয় ধীরগতিতে, কয়েক মাস এমনকি বছর ধরে হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার হঠাৎ করেই হার্নিয়া হতে পারে। তাছাড়া হার্নিয়া হলে মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকে।

প্রকারভেদ

অবস্থানভেদে হার্নিয়াকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে-

- ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া (Inguinal Hernia): এই ধরণের হার্নিয়ায় অন্ত্রের অংশবিশেষ উদর ও উরুর সংযোগস্থল ইঙ্গুইনাল রিজিয়ন দিয়ে প্রবেশ করে। তখন উদর ও উরুর সংযোগস্থল ফোলা মনে হয়
- ফিমোরাল হার্নিয়া (Femoral Hernia): ফিমোরাল হার্নিয়া সাধারণত মহিলাদের হয়। এক্ষেত্রে উরুর ভেতরের দিকে স্ফিতি দেখা দেয়
- আম্বিলিকাল হার্নিয়া (Umbilical Hernia): এক্ষেত্রে নাভির চারপাশ বা এক পাশ ফুলে ওঠে
- হায়াটাল হার্নিয়া (Hiatal Hernia): এই ধরণের হার্নিয়ায় পাকস্থলীর কিছু অংশ বা অন্ত্রের অংশবিশেষ ডায়াফ্রামের মধ্য দিয়ে বক্ষ গহ্বরে প্রবেশ করে

• ইনসিশনাল হার্নিয়া (Incisionnal Hernia): পূর্বে সার্জারি হয়েছে এমন অংশে স্ফিতি দেখা দেয়

কারণ

যেসব কারণে হার্নিয়া হয়-

- দীর্ঘদিন যাবত কাশি থাকলে
- জন্মগত ত্রুটির থাকলে
- আঘাত জনিত কারণে
- অপারেশনের জায়গায় ইনফেকশন হলে
- দীর্ঘদিন যাবত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে
- প্রোস্টেটগ্রন্থি বড় হয়ে গেলে
- গর্ভাবস্থার কারণে
- ভারবাহী কাজ করলে

লক্ষণ

অবস্থানভেদে হার্নিয়া হলে লক্ষণসমূহ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে-

- ফোলা অংশে তীব্র ব্যথা হওয়া
- বমি ভাব হওয়া
- কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া
- হার্নিয়ার স্থান ফুলে যাওয়া

ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস

উপরের লক্ষণগুলো অন্যান্য যে সকল রোগের লক্ষণের সাথে মিল পাওয়া যায় তা নিচে দেওয়া হলো-

- হাইড্রোসিল
- স্পার্মাটোসিল

শারীরিক পরীক্ষা

সাধারণত শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের হার্নিয়া নির্ণয় করা হয়ে থাকে। হার্নিয়ার উপসর্গগুলো জেনে তারপর স্থানভেদে ফোলা অংশটি পরীক্ষা করে দেখা হয়। যেহেতু কাশি দিলে যেকোন স্থানের হার্নিয়া বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তাই কাশি দেয়াটাও শারীরিক পরীক্ষার একটা অংশ।

চিকিৎসা

যদি হার্নিয়া ছোট থাকে এবং কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে তাহলে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কিন্তু হার্নিয়া যদি বড় হতে থাকে এবং ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে।

হার্নিয়ায় দুই ধরণের অপারেশন করা হয়-

১) হার্নিয়োটোমি এবং হার্নিয়োর‍্যাফি

২) হার্নিয়োপ্লাস্টি

১) হার্নিয়োটোমি এবং হার্নিয়োর‍্যাফি

এ পদ্ধতিতে হার্নিয়ার স্থানে একটা ইনসিশন দিয়ে বেরিয়ে আসা অংশকে ঠেলে নির্দিষ্ট স্থানে পুনরায় প্রতিস্থাপন করা হয়। তারপর দুর্বল বা ছেঁড়া মাংসপেশী সেলাই করে ঠিক করে দেয়া হয়।

২) হার্নিয়োপ্লাস্টি

এ পদ্ধতিতে হার্নিয়ার স্থানে একটা লম্বা ইনসিশন দিয়ে জালিকার মতো এক টুকরো সিনথেটিক মেশ লাগিয়ে দেয়া হয়। সেলাই, ক্লিপ অথবা স্টাপল করে সিনথেটিক মেশটিকে হার্নিয়ার স্থানে আটকে রাখা হয়। বর্তমানে ল্যাপারোস্কপি মাধ্যমেও হার্নিয়োপ্লাস্টি করা হয়।

হার্নিয়োপ্লাস্টি

জটিলতা

হার্নিয়া হলে নিচের জটিলতাসমূহ হতে পারে-

- ধীরে ধীরে হার্নিয়ার আকার বড় হওয়া
- হার্নিয়া আটকে যাওয়া
- গ্যাংগ্রিন হওয়া
- পেরিটোনাইটিস হওয়া
- সেফটিসেমিয়া হওয়া

প্রতিরোধ

যদি জন্মগত ত্রুটির কারণে হার্নিয়া হয়ে থাকে সেটা প্রতিরোধ করা যায় না, তবে জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে এ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে-

- শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখতে হবে
- নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে
- ভারী বস্তু উত্তোলন না করা
- কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধের জন্য আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে
- ধূমপান না করা। ধূমপান করলে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হয়, যার জন্য **ইঙ্গুইনাল** হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

গ্লুকোমিটার ব্যবহার করার নিয়ম

বর্তমান বিশ্বে যে রোগগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে ডায়াবেটিস রোগ অন্যতম। শরীরের প্রয়োজনীয় হরমোন ইনসুলিনের অভাবে অথবা ইনসুলিনের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ার কারণে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, দুর্বলতা অনুভূত হয়, সার্বক্ষণিক ক্ষুধা পায়, স্বল্প সময়ে দেহের ওজন হ্রাস পায়, চোখে ঝাপসা দেখে, অধিক তৃষ্ণার্ত অনুভব করে এবং বার বার মুখ শুকিয়ে যায়। এই রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। সুস্থ লোকের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খালি পেটে ৫.৬ মিলিমোল/ লিঃ (১১০ মিলিগ্রাম/ ডেসি লিঃ) এর কম এবং খাবার দুই ঘণ্টা পরে ৭.৮ মিলিমোল/ লিঃ (১৪০ মিলিগ্রাম/ ডেসি লিঃ) এর কম থাকে। খালি পেটে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৭.৮ মিলিমোল/ লিঃ (১৪০ মিলিগ্রাম/ ডেসি লিঃ) এর বেশি হলে অথবা ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ১১.১ মিলিমোল/ লিঃ (২০০ মিলিগ্রাম/ ডেসি লিঃ) এর বেশি হলে ডায়াবেটিস হয়েছে বলে ধরা হয়। ডায়াবেটিস রোগটি কখনো পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় না। তবে ঠিকমতো নিয়মকানুন ও নির্দেশ মেনে চললে এটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব। গ্লুকোমিটার হলো রক্তে গ্লুকোজ পরিমাপের যন্ত্র। যেখানে ল্যাবরেটরি নেই সেখানে রোগীদের একমাত্র সাহায্যকারী এই যন্ত্র। ডায়াবেটিস রোগে গ্লুকোমিটার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়।

গ্লুকোমিটার ব্যবহার করার নিয়ম

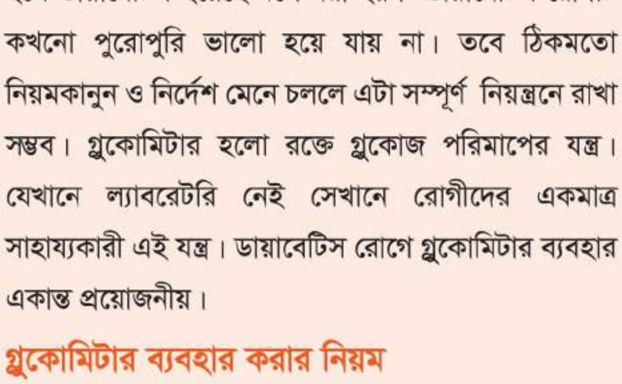

সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে

২য় ধাপ

গ্লুকোমিটারে স্ট্রিপ প্রবেশ করে গ্লুকোমিটার চালু করতে হবে

৩য় ধাপ

আঙ্গুলের অগ্রভাগ জীবাণুমুক্ত তুলা স্পিরিটে ভিজিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে

৪র্থ ধাপ

আঙ্গুলের অগ্রভাগের পাশের দিকটি ল্যানসেট (Lancet) দিয়ে ফুটো (Pric) করতে হবে। রক্তের ফোঁটা (Blood Drop) বের হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে

৫ম ধাপ

রক্তের ফোঁটাটি স্ট্রিপের সামনের অংশে স্থাপন করতে হবে

৬ষ্ঠ ধাপ

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে। রক্তের প্লাজমায় গ্লুকোজের পরিমাণ গ্লুকোমিটারের পর্দায় (Screen) দেখা যাবে

৭ম ধাপ

স্ট্রিপ সরিয়ে নিয়ে গ্লুকোমিটারটি বন্ধ হয়ে যাবে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

হার্টের সুস্থতায় ৬ টি খাবার

রসুন

রসুন হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং প্রাকৃতিকভাবেই এটি হার্টের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি শুধু রক্ত চলাচলকেই স্বাভাবিক রাখে না, একই সাথে হার্টকেও সুস্থ রাখে।

আদা

আদা এমন একটি ঔষুধি উদ্ভিদ যা রক্তনালীকে বিশ্রাম দেয় এবং রক্ত প্রবাহকে চালু রাখতে সাহায্য করে। হার্টের অসুখের বিরুদ্ধে এন্টিইনফ্ল্যামেটরি হিসেবেও কাজ করে।

আমলকী

হার্টকে ভালো রাখার জন্য আমলকী সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে। প্রায় সব ধরণের হার্টের রোগ প্রতিরোধ করে আমলকী।

বাদাম

হার্টের জন্য বাদাম খুবই উপকারী। বাদামে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট আছে যেটা আমাদের শরীরে থাকা ক্ষতিকর টক্সিন এবং রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

সবুজ চা

বর্তমান সময়ে হার্টের জন্য সবচেয়ে বেশি ওষুধের কাজ করে সবুজ চা। এটি রক্তের শিরাকে সচল রাখে এবং রক্ষা করে।

পুদিনা পাতা

এটি হার্টের জন্য অত্যন্ত কার্যকরি। পুদিনা পাতা রক্তের শিরায় অক্সিজেন চলাচলে সাহায্য করে। এছাড়া এটি খেলে হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ **'গর্ভকালীন ডায়াবেটিস'** থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ৩০ জুন ২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১) সম্পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মায়ের ওজন কত কেজি বাড়বে?

ক) ২-৩ কেজি
খ) ১০-১৫ কেজি
গ) ৬-৭ কেজি
ঘ) ২০-২৫ কেজি

২) কোন পরীক্ষাটি গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে করা হয় না?

ক) ওজিটিটি
খ) এক্স-রে
গ) আর বি এস
ঘ) প্রস্রাব পরীক্ষা

৩) গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের প্রধান ওষুধ কোনটি?

ক) মেটফরমিন
খ) ইনসুলিন
গ) গ্লিকাজাইড
ঘ) লিনাগ্লিপটিন

৪) কি কারনে গর্ভকালীন সময়ে মায়েরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়?

ক) গর্ভফুলের হরমোনের তারতম্য এর জন্য
খ) কম বয়সে গর্ভধারণের জন্য
গ) ডিম্বাশয়ের হরমোনের তারতম্য এর জন্য
ঘ) উপরের কোনটিই নয়

৫) গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কাদের?

ক) গর্ভধারণের পূর্বে যদি ডায়াবেটিস থাকে
খ) উচ্চতা অনুযায়ী ওজন বেশি হলে
গ) পরিবারের কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে
ঘ) উপরের সবগুলো

৬) গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে জটিলতা এড়াতে করণীয় কি?

ক) পরিকল্পিত গর্ভধারণ
খ) সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা
গ) ডায়াবেটিস ধরা পড়লে ওষুধ খাওয়া
ঘ) উপরের কোনটিই নয়

৭) গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে কি কি লক্ষণ দেখা যায়?

ক) দূর্বলতা অনুভূত হওয়া
খ) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
গ) ঘন ঘন পিপাসা লাগা
ঘ) উপরের সবগুলো

৮) গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে কি কি জটিলতা দেখা যায়?

ক) সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়া
খ) প্রসব পরবর্তী ইনফেকশন হওয়া
গ) প্রি-এক্লাম্পসিয়া হওয়া
ঘ) উপরের সবগুলো

৯) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কত হলে ওজিটিটি পরীক্ষা করতে হবে?

ক) > ৭.৮ মিলিমোল/লিটার হলে
খ) < ৭.৮ মিলিমোল/লিটার হলে
গ) > ১১.১ মিলিমোল/লিটার হলে
ঘ) < ১১.১ মিলিমোল/লিটার হলে

১০) গর্ভবতী মায়ের বয়স কত হলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা থাকে?

ক) ২০ বছর
খ) ২৫ বছর
গ) ৩২ বছর
ঘ) ২২ বছর

ACI
এডভান্সড কেমিক্যাল
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২